Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৩০ জুন, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ২৬ সংখ্যা ২৯ জুন, ২০১৫, সোমবার, ১৩ আষাঢ়, ১৪২২

খণ্ডঘোষ হত্যাকাণ্ড

তৃণমূলের নেতারাই সি বি আই চাইছে—সূর্যকান্ত মিশ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ জুন : তৃণমূলের হাতে তৃণমূল খুন হচ্ছে। সেই খুনের কিনারা করতে তার দলের লোকেরাই সি বি আই চাইছে---বললেন বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র। সি পি আই (এম) বর্ধমান জেলা কমিটি আয়োজিত এক কর্মী বৈঠকে সংস্কৃতিতে আসেন তিনি। খণ্ডঘোষে তৃণমূলের তিনজন খুন হওয়া প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জানান, এ ঘটনায় জেলার এক মন্ত্রী, পুলিশ ষড়যন্ত্রে জড়িত। কেন মন্ত্রী এলাকায় যেতে পারছেন না? ঘটনাকে চাপা দিতে পুলিশ সুয়োমোটো মামলা করে আসল অপরাধীদের আড়াল করতে চাইছে। বালিখাদকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মানুষ নিহত হবে, আর এস. পি-কে ধামাচাপা দিতে ষড়যন্ত্র করতে হবে। এখনও পর্যন্ত পুলিশ অভিযুক্তদের ধরতে পারে নি।

মুখ্যমন্ত্রীর আসন্ন জেলা সফর প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, জেলা সফর করে তিনি কোটি কোটি টাকা নয়ছয় করছেন। কার্যত সরকারি অনুষ্ঠানকে দলীয় অনুষ্ঠানে পরিণত করছেন। বিরোধী কোনো জনপ্রতিনিধিকে না ডেকে বাসে করে লোকভর্তি করে এক একটি বৈঠকে কোটি টাকার ওপর খরচ হচ্ছে। এর ফল ভোগ করতে হচ্ছে রাজ্যবাসীকে। ঐ টাকা দিয়ে কৃষকদের ফসল সরকারি দামে কেনা যেত। কৃষক আত্মহত্যা করছে। ১০০ দিনের কাজ নেই। সমস্ত ভাতাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। এভাবে সরকার চলতে থাকলে ৫ বছরে ১ লক্ষ কোটি টাকা দেনা মানুষের ঘাড়ে চাপবে।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সি পি আই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ, রাজ্য কমিটির সদস্য অমল হালদার এবং জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক।

সি বি আই চাইছে নিহতদের পরিজনরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ জুন : ওঁড়ারি ও উজ্জ্বলপুকুরে মোট ৩ জন খুনের প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বার করতে সি বি আই-এর তদন্ত চাইলো খুন হয়ে যাওয়া পরিবারগুলির পরিজনরা। আজ দুপুরে বর্ধমানের জেলা পুলিশ সুপারের অফিসে অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট-এর ব্যানারে বিক্ষোভকারীরা ১১ দফা দাবি সম্মিলিত স্মারকলিপি তুলে দেয়। যাদের নামে এফ. আই. আর আছে অবিলম্বে তাদের গ্রেপ্তার ও গ্রামের সাধারণ মানুষ হয়রান না করারও দাবি জানানো হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে হাজির ছিলেন মৃত জামালউদ্দিনের ভাই, বিধবা স্ত্রী রেশমী বেগম ও তার দুই মেয়ে ইমফোতারা বেগম ও মৌসুমী খাতুন। উপস্থিত ছিলেন লায়েক আয়নালেক-এর বিধবা স্ত্রী হলিমা বেগম।

আবারও আত্মঘাতী কৃষক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ জুন : মহাজানি ঋণ খেলাপ হওয়ায় তীব্র অপমানিত হন গুনারের সিদ্ধার্থ যশ। ২৮ জুন রায়না থানার গুনার গ্রামের চাষি সিদ্ধার্থ যশের (৪৩) কীটনাশক খেয়ে মৃত্যু হয়।

এনিয়ে শস্যভাণ্ডার বর্ধমান জেলাতে আলু, ধান নিয়ে মৃত্যু হলো ১২ জনের। অথচ খাদ্যমন্ত্রী সমানে বলে যাচ্ছেন সরকারি দামে ধান কেনা হচ্ছে। অথচ গ্রাম গিয়ে দেখা গেল প্রত্যেকটি বাড়িতে সাড়ি সাড়ি মড়াই। সবার ধান অবিক্রি। তার আগে লোকসান গেছে আলু চাষে।

আত্মঘাতী কৃষকের জামাই সুমন্ত সামন্ত জানিয়েছেন শ্বশুরমশাই-এর ১৩ বিঘা চাষের জমি। এর মধ্যে ৭ বিঘা আলু চাষ করেন, বাকিটা বোরো চাষ করেন। আলুতেও চরম লোকসান। ভেবেছিলেন বোরোতে পুষিয়ে নেবেন। তা তো হলোই না। উল্টে ৮০ হাজার টাকা দেনা হয়ে যায়।

সি আই টি ইউ-র শহর সমন্বয় কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ জুন : সি আই টি ইউ বর্ধমান শহর সমন্বয় কমিটির সাংগঠনিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল আজ বর্ধমান টাউনহলে। কনভেনশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সি আই টি ইউ-র বর্ধমান জেলা সাধারণ সম্পাদক বংশগোপাল চৌধুরী। কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন জেলা সি আই টি ইউ-র নেতা সুকান্ত কোঙার, কালিশঙ্কর পাল, নজরুল ইসলাম প্রমুখ। সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন বিদায়ী সম্পাদক তড়িৎ ঘোষ। কনভেনশন থেকে সর্বসম্মতি ক্রমে ১০৮ জনের কমিটি ও তরুণ রায় সম্পাদক নির্বাচিত হন।

সাজানো মামলার প্রতিবাদে ও নির্দোষদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ জুন : মিথ্যা ও সাজানো মামলা প্রত্যাহার, নির্দোষ ও নিরপরাধদের মুক্তির দাবিতে জেলা জুড়ে থানায়-থানায় ডেপুটেশন ও সমাবেশ কর্মসূচি পালন করলো সি পি আই(এম)। এদিন সি পি আই(এম) জোনাল কমিটিগুলির উদ্যোগে জেলার প্রায় সর্বত্রই গণ-ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ সমাবেশ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। সম্প্রতি খণ্ডঘোষে তৃণমূল-কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দলে নিহত ৩ তৃণমূলি ও তাকে ঘিরে নিরপরাধ ব্যক্তি গ্রেফাতারের প্রতিবাদেও এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলার দাবিতে সি পি আই(এম)-এর উদ্যোগে শান্তি মিছিল ও ডেপুটেশন আন্দোলন কর্মসূচিকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। রায়নার মাধবডিহিতে প্রায় ১০ সহস্রাধিক মানুষের মিছিল এলাকা পরিক্রমা করেছে।

খণ্ডঘোষ থানার ওঁয়ারী গ্রামে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে তিনজনের খুনের ঘটনায় এদিন খণ্ডঘোষ ডাকবাংলো মোড় থেকে হাজার হাজার মানুষ মিছিল করে সি পি আই(এম) খণ্ডঘোষ থানার সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন ও থানায় ডেপুটেশন দেন। জনতার সামনে বক্তব্য রাখেন সি পি আই(এম) রাজ্য কমিটি সদস্য অমল হালদার। তিনি বলেন, রাজ্যে এখন আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে এলাকাতে তিনজন খুন হলো। দাবি করা হয় এই ঘটনায় যে নিরপরাধ ব্যক্তিদের আটক করছে তাদের অবিলম্বে ছাড়ার ব্যবস্থা করুক পুলিশ। নিরপরাধ ব্যক্তির স্বার্থে প্রয়োজনে হাইকোর্টে যাওয়ার কথা বলেন তিনি।

এদিন ভাতার থানায় বিক্ষোভ ও ঘেরাও করেন হাজার হাজার মানুষ। স্মারকলিপি দেওয়া হয় ব্লক অফিসে। জামালপুরেও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। খানা জংশন বাজারে সভা হয়। দুর্গাপুরে হাজার হাজার মানুষের বিশাল মিছিল দুর্গাপুর থানা ঘেরাও করেন।

এদিন কুলটি থানায় বামফ্রন্টের উদ্যোগে বিক্ষোভ সংগঠিত হলো।

এছাড়াও বিক্ষোভ সমাবেশ হয় কালনা, মেমারি ও অন্ডালে।

নবান্ন ঠিক করে দেবে বালির টাকা পাবে কোন নেতা

বিশেষ সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ জুন : বালির দখল কার হাতে থাকবে? এ নিয়ে তৃণমূলের হাতে তৃণমূলির তিন জন খুন হয়ে যাওয়া খণ্ডঘোষের ওঁয়াড়ি গ্রামে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুসছে গোটা এলাকা। আসল অপরাধীদের না ধরে ঠাণ্ডা মাথায় খুনকে সংঘর্ষে মৃত্যু বলে তত্ত্ব খাড়া করছে পুলিশ।

রমজান মাসের তৃতীয় দিনে ২১ জুন নৃশংসভাবে খুন হন মহম্মদ জামালউদ্দিন, সেখ সওকত ও পাশের উজলপুকুর গ্রামের সেখ আইনাল লায়েক। রমজান মাস সাধারনত মুসলিম সমাজের কাছে সংযম ও শান্তির মাস। সেই সরল বিশ্বাসে রাত্রি ১২টায় ফোন পেয়ে ঐ গ্রামের বাগদি পাড়ায় একটি পুকুর পাড়ে পৃথক পৃথক তিনজন হাজির হয়। তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেনের দলবল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নৃশংসভাবে খুন হন তিনজন। খুন হয়ে যাওয়া পরিবারের পক্ষ থেকে এমনই অভিযোগ করেন ১৬ জনের বিরুদ্ধে। পুলিশ মূল অভিযুক্তদের না ধরে স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে সংঘর্ষের জেরে তিনজন খুন হয়েছে বলে ৪৩ জনের নামে মামলা রুজু করে। দুটি অভিযোগই মূল অভিযুক্ত তৃণমূলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেনের বিরুদ্ধে। অথচ পুলিশ নিরপরাধ ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও কোর্টে চালনা দিয়ে আসল অপরাধীদের আড়াল করতে চাইছে। নিরাপরাধ ব্যক্তিদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য এবং আসল অভিযুক্তদের ধরার জন্য খুন হওয়া পরিবারগুলির পক্ষ থেকে ২৬ জুন এস পি-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ঘটনার এক সপ্তাহ কেটে গেলেও আসল অভিযুক্ত এখনও ধরা পরেনি।

এর আগে তিন বছর ধরে বামপন্থী কর্মীদের পুলিশের সাহায্য নিয়ে ঘরছাড়া, মিথ্যা মামলায় জড়ানো, খুনের হুমকি সন্ত্রস্ত করে এলাকাকে বিরোধীশূন্য করেছে। একটাই কারণ, বালির দখল নেওয়া। এখন পঞ্চায়েতে নির্বাচনে জোর করে দখল করা পঞ্চায়েতে কার হাতে থাকবে ক্ষমতা? কার হাতে থাকবে বালির দখল? তার লড়াই-এ বালি হচ্ছে নিরীহ, খেটে-খাওয়া তৃণমূল সমর্থক। রাজায় রাজায় (বর্তমান সভাপতি বনাম প্রাক্তন সভাপতি) যুদ্ধ হয় উলু খাগড়ায় প্রাণ যায়।

ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে কয়েক বছর আগেও প্রায় সাতশো বালি খাদান দীর্ঘমেয়াদি লিজ পেতো। এখন তা দাঁড়িয়েছে দু'শোরও কমে। অন্যদিকে জেলাতে প্রায় ৪০০ খাদান বে-আইনিভাবে চলছে। রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার। ফুলে ফেঁপে উঠছে তৃণমূলের রাশ যার হাতে। বেআইনি খাদান যে চলছে তা নিজে এসে দেখে রাজ্যের সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬ জুন জামালপুরে হাতে নাতে ধরে ফেলেন এবং তীব্র ক্ষোভ উগড়ে দেন ভূমি সংস্কার অফিসারদের বিরুদ্ধে। এর জেড়েই খুন হতে হয়েছে মাস দুয়েক আগে রায়না-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আব্দুল আলিমকে। সমস্ত ক্ষেত্রেই নিজেদের অর্ন্তদলীয় দ্বন্দ্বকে সি পি আই(এম)-র ঘাড়ে চাপিয়ে দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছে। এলাকার মানুষ এবং খুন হয়ে যাওয়া পরিবার একে ভাল চোখে নিচ্ছে না বলেই এবার পিছু হটেছেন। জেলা সভাপতি এবং মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। নিচুতলার কর্মীদের অভিযাগ, দলের কিছু জেলা নেতার সঙ্গে বালি মাফিয়াদের আঁতাত রয়েছে।

দলের অবস্থা এখন এমন স্তরে পৌঁছেছে যেখানে জেলা নেতাদের আর নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং খুনোখুনি রুখতে পুলিশকে মাঠে নামার নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। এই নির্দেশ পেয়ে জেলার পুলিশ সুপার কুনাল আগরবাল প্রতিটি থানাকে নির্দেশ দেন, তৃণমূলের সব গোষ্ঠীর সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। ইতিমধ্যেই কাটোয়া, মেমারি, রায়না, মাধবডিহি, বর্ধমান ও জামালপুর থানায় নেতাদের ডেকে একপ্রস্থ বৈঠক হয়ে গেছে। কাদের ডাকা হবে তা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ সুপার সংশ্লিষ্ট থানার আই.সি. ও.সি দের হাতে। রকম সকম দেখে বিরোধী দলগুলি প্রশ্ন তুলেছে শাসকদলের ঘরোয়া কোন্দল মেটানোও কি এখন পুলিশের কাজের মধ্যে পড়ে? সি পি আই(এম) রাজ্য কমিটির নেতা অমল হালদার কটাক্ষ করেন—'তৃণমূলের দ্বন্দ্ব তো তোলা আদায়কে কেন্দ্র করে। তাহলে তোলা পাবে না জেনেই পুলিশ এত সক্রিয়?

আই. জে. এ-র হার্ট চেক-আপ ক্যাম্প

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ জুন : আজ আই জে এ বর্ধমান শাখার উদ্যোগে তিনকোনিয়াস্থিত বর্ধমান লায়ন্স ক্লাবে একদিনের হার্টি চেক-আপ শিবিরের আয়োজন করা হয়। চেক-আপ করেন অ্যামরি হাসপাতাল ঢাকুরিয়া শাখার চিকিৎসকরা। সংগঠনের সম্পাদক আমিনুর রহমান বলেন, পেশাগত কারণেই সাংবাদিকরা চেক-আপ করার সুযোগ পান না। তার জন্য এই শিবির। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি তারকনাথ রায়। এদিন শহর ও জেলার বহু কর্মরত সাংবাদিক শিবিরে যোগ দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করান।

প্রকাশিত হবে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা ২০১৫

সীমিত সামর্থ্য, সীমিত উপাদান ও নানান প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জেলা শহর থেকে প্রকাশিত এক অনবদ্য প্রকাশনা যার খ্যাতি রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে। সমাদৃত হয়ে চলেছে পাঠককুলের মধ্যে নিরন্তর। তার অতীত গরিমা ও ঐতিহ্যকে অম্লান রেখে আবার হাজির হবে পাঠকের দরবারে।

আপনিও আপনার মৌলিক রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ করতে পারেন এই পত্রিকাকে। তবে লেখা পাঠাতে হবে ১৫ আগস্ট, ২০১৫ তারিখের মধ্যে পত্রিকা দপ্তরে।

নতুন চিঠি, ৬২ বি. সি রোড, আরতি সিনেমা লেন, বর্ধমান - ৭১৩১০১
e-mail id : weeklynatunchithi@gmail.com,
dinesh.jha09@gmail.com

নতুন চিঠি

২৯ জুন, ২০১৫

বিজেপি-র স্বরূপ

রাজনীতির দুবৃত্তায়ন ও ভ্রষ্টাচার কোন্ পর্যায়ে যেতে পারে, তৃণমূল শাসনাধীন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। অনেকের ধারণা ছিল, হিন্দুত্ববাদী উগ্রতা সত্ত্বেও বিজেপি দলটি বোধ হয় তার পূর্ববর্তী শাসকদল কংগ্রেস এবং পশ্চিমবঙ্গের শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের মতো দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। নরেন্দ্র মোদিজির বাক্-বিভূতিতেও মুগ্ধ হয়ে অনেকে ভেবেছিলেন, তাঁর সরকার বোধহয় একটু উন্নততর হবে। কিন্তু বছর পেরোতে না পেরোতেই দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচারে এই দলটিও বিন্দুমাত্র পিছিয়ে নেই। উচ্চতম স্তরের নেতা ও মন্ত্রীদের সম্পর্কে সম্প্রতি যেসব অনৈতিকতার উদাহরণ বেরিয়ে আসছে, এবং নীরবতা অবলম্বন করে নরেন্দ্র মোদি যেভাবে সেগুলিকে পরোক্ষ সমর্থন জানিয়ে চলেছেন তাতে সত্যিই হতবাক হতে হয়।

স্মৃতি ইরানি, সুষমা স্বরাজ, বসুন্ধরা রাজে, পঙ্কজা মুণ্ডে—একের পর এক উচ্চবর্গীয় নেতাদের নাম উঠে আসছে দুর্নীতির শীর্ষ তালিকায়। স্মৃতি ইরানি শিক্ষামন্ত্রী, কিন্তু তাঁর নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন, প্রশ্ন নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে তাঁর মিথ্যাভাষণ নিয়েও। বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ নিজের ক্ষমতা খাটিয়ে গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ললিত মোদিকে বিদেশে পাঠিয়ে রেহাই-এর ব্যবস্থা করেছেন সমস্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিয়ম-বিধি লঙ্ঘন করে। ললিত মোদির বিদেশ-বাসের ব্যবস্থায় বিজেপি-শাসিত রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজের উদ্যোগও এখন বিরাট প্রশ্নের মুখে। অন্যদিকে বিজেপি-শাসিত মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী পঙ্কজা মুণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ কোনো টেন্ডার না ডেকে ২০৬ কোটি টাকা কাজের বরাত দেবার।

সারা দেশ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই বিষয়টি নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠলেও প্রধামন্ত্রী নরেন্দ্র মাদি নীরবতাকেই শ্রেষ্ঠ পন্থা হিসাবে বেছে নিয়েছেন। কোনো উচ্চবাচ্য বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার ইঙ্গিতমাত্র নেই। ফলে ছোট মোদি হিসাবে কার্যত ললিত মোদি বড় মোদি নরেন্দ্র মোদির প্রতি এতটাই কৃতজ্ঞস্থ হয়ে পড়েছেন যে বিদেশে পলায়িত অবস্থায় ইন্টারনেটে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর গুণকীর্তন শুরু করেছেন। অন্যদিকে বিজেপি দলের মধ্যে আদবানির মতো নেতা ব্রাত্য হয়ে পড়েছেন।

স্বভাবতই, বিজেপি-র সাধারণ অনুরাগীদের মধ্যেও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। দুর্নীতি দমনের প্রতিশ্রুতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে যাঁরা কংগ্রেসের বদলে বিজেপি-কে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছিলেন, এক বছরের মধ্যেই সেই দলের স্বরূপ উদঘাটন তাঁদের হতবাক করে দিয়েছে।

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে কাটোয়া রুটের নর্জার অস্থায়ী সেতু। যান চলাচল বন্ধ ২৭ জুন।

এক ডজন প্রশ্ন

১. পলাশির যুদ্ধ কবে শেষ হয়?
২. পোলিও টিকা আবিষ্কারক কে ছিলেন? তিনি কবে প্রয়াত হন?
৩. কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানার প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? তাঁর কবে জন্ম?
৪. সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার কবে হন? কোন দিন পর্যন্ত ঐ পদে ছিলেন?
৫. বর্ধমান জেলার কমিউনিস্ট নেতা, বর্ধমানের প্রথম শহিদ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কবে কোথায় জন্মান? কবে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন?
৬. কবে ভারতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি জরুরি অবস্থা জারি করেন?
৭. মাদা গাস্কার কোন মাহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৮. সি পি আই(এম) দলের মুখপত্র 'পিপলস ডেমোক্রাসি' কবে প্রথম প্রকাশিত হয়?
৯. এ টি এম কবে কোথায় প্রথম বসানো হয়? কে এই এ টি এম তৈরি করেন?
১০. জিবুটি দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাধধানী কোথায়?
১১. হাওড়া থেকে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত কবে প্রথম ট্রেন চালানো হয়েছিল?
১২. কালকা সিমলা রেলপথ তৈরির কাজ কবে প্রথম শুরু হয়? কবে শেষ হয়েছিল?

(উত্তর শেষের পাতায়)

ফিরে দেখা জরুরি অবস্থা

অরুণ মজুমদার

১৯৭৫-এর ২৬ জুন সকালে গেছি 'গণশক্তি' প্রেসে। তখন ৩৩ আলিমুদ্দিনেই সব অফিস। দোতলায় কিছুটা অংশ গণশক্তি পত্রিকার অফিস। একতলায় ছাপাখানা। 'নন্দন' পত্রিকার আমি সর্বসময়ের কর্মী। মাসের শেষ, প্রচুর প্রুফ দেখতে হবে। দোতলায় কল্যাণ দাশগুপ্তের ঘরে বসে কথা বলছি। কল্যাণদা ভিতর থেকে এসেই জানালেন—বাড়ি চলে যা, যে কোনো সময় পুলিশ আসতে পারে। গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে পারে।' 'কিন্তু কল্যাণদা আমার যে অনেক প্রুফ দেখতে হবে। সামনের মাসের তিন তারিখ পত্রিকা প্রকাশিত হবে। আমি প্রুফ দেখেই যাব, যদি ধরে ধরবে। কী আর করা যাবে।' রাত্রে ফেরার পথে রাস্তাঘাট সুনশান।

সরকারি আদেশ হল, সব লেখা সেন্সারশিপের আওতায় আনা হল। যে-কোনো লেখা রাইটার্সের একতলায় তথ্য দপ্তরের একটি অফিস আছে সেখানে প্রুফ কপি নিয়ে যেতে হবে। আধিকারিকরা পড়বেন, কাটাকুটি করে ছাপ দেবেন, ছাপা যাবে কি যাবে না। রাইটার্সে জেলা পর্যায়ের অফিসাররা বসেন। তাঁরাই দেখে দেবেন। প্রথম ক'দিন তো গাদা প্রুফ দিয়ে এলাম। প্রতিদিনই যাচ্ছি আর ফিরে আসছি। দেখা আর হয় না। এদিকে গাদা টাইপ আটকে আছে একটা ফর্মা ছাপা না হলে তো কম্পোজ বন্ধ। তখন তথ্য অধিকর্তা ছিলেন কবি গোপাল ভৌমিক। তিন তলায় তাঁর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। বললাম, 'আপনি তো বুঝবেন প্রেসের সমস্যা। একটু তাড়াতাড়ি না ছাড়লে আমাদের অবস্থা তো কাহিল।' গোপালবাবু ভাল মানুষ, সহৃদয় ভাবেই বোঝালেন বিষয়টা নতুন। আমাদের এত লোকবল নেই একটু অপেক্ষা করুন, চেষ্টা করছি তাড়াতাড়ি ছাড়তে। কয়েকজন আধিকারিক তো লেখা আটকাতে পারলে ধন্য হতেন। জওহরলাল নেহেরুর লেখা কোটেশন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, সবার লেখাই বাদ। 'একসাথে' পত্রিকার সম্পাদিকা কনক মুখার্জীর লেখায় শরৎচন্দ্রের নারী প্রসঙ্গে একটি কোটেশন ছিল। আধিকারিক তা কেটে দিলেন। কনকদির কাছে শুনে ক'দিন পর সেই আধিকারিককে বললাম, ''আপনার সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি নাকি কনকদির কাছে 'স্বাধীনতা' পত্রিকায়। গুরুদক্ষিণা দিয়ে দিলেন।' একটু লজ্জা পেলেন। বললেন কালকে নিয়ে আসবেন। স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয় নিয়ে যেতেন জনৈক মি. ব্যানার্জী। আধিকারিকরা তার লেখার মানে বুঝতে পারছেন না। নিয়ে গেলেন মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জীর কাছে। তিনি জানালেন বুঝতে না পারলে কেটে দেবেন। কোনো রিস্ক নেওয়া যাবে না। পত্রিকার বিভিন্ন অংশ সাদা থেকে যেতে লাগলো। অনেক কথাই বলা হতে লাগলো কোনো কথা না বলে। ফলে নির্দেশ এলো কোনো অংশ সাদা থাকা চলবে না। গৌরকিশোর ঘোষ, বরুণ সেনগুপ্ত গ্রেফতার হলেন। আনন্দবাজারে সে খবর ছাপা হল না। শুধু মাত্র গণশক্তি খবরটা ছেপেছিল। আবার বেশ কয়েকজন আধিকারিক বেশ আন্তরিক ব্যবহার করতেন। কবি প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের একটা কবিতা ওনার খুব ভাল লেগেছিল। বললেন, এটা এভাবে হবে না। আজকে এটা নিয়ে যান, পরশু দিন আবার আমি আসবো। কালি বেশি দিয়ে ধ্যাবড়া একটা প্রুফ আনবেন যাতে ভালো ভাবে পড়া না যায়। আমি পাস করে দেব। আর একটা ভাল কপি আনবেন আমাদের পাড়ায় একটা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় দেব। জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা আপনারা কেটে তো দিলেন। এগুলি ঠিকঠাক ছাপছি কি-না কে মেলান সেগুলি?' মুখ তুলে আস্তে আস্তে বললেন, 'আমাদের কাজ ওটা না। তবে আপনাদের কিছু পুরানো বন্ধু বর্তমান সরকারের শরিক তারাই খবর দেন তেমন কিছু ঘটলে।' গণশক্তিতে রিপোর্টিং-এ ছিল মৌলালিতে রথের মেলায় কী কী আছে। তাতে এক জায়গায় ছিল রাশিয়ান কথা বলা পুতুল। ওটা রাখতে দেয়নি। জেলা শহরগুলির অবস্থা তো আরো খারাপ।

প্রতিবাদ-প্রতিরোধ তো মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। বর্ধমানের সাংবাদিকরা কিন্তু থেমে যান নি। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাড়িয়েই তাঁরা তৈরি করেছিলেন বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাব। এখনো সেটি বহমান স্বাধীন সত্তা বজায় রেখেই।

জরুরি অবস্থায় সরকারি সিলমোহরে বর্জিত অংশগুলিকে নিয়ে বন্ধুবর বোম্মানা বিশ্বনাথন একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেছিলেন। উঠে যাবার পরপরই। বোম্মানা প্রয়াত হয়েছেন অনেকদিন—বইটি কি আর আছে কোথাও?

১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচন দেশের বিগত ক'টি লোকসভা নির্বাচনের মতোই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। না সবটা নির্বিঘ্নে বলা যাবে না। রায়বেরিলি কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি তাঁদের প্রায় পারিবারিক কেন্দ্র থেকে বিজয়ী হলেন বিপুল ভোটাধিক্যে। পরাজিত হলেন রাজনারায়ণ নামে জনৈক প্রার্থী। রাজনারায়ণ এলাহাবাদ হাইকোর্টে একটি মামলা ঠুকে দিলেন প্রচুর প্রমাণ সহ যে ইন্দিরা গান্ধি সরকারি ক্ষমতার যথেচ্ছ অপপ্রয়োগ করে নির্বাচনে জিতেছেন। কেউই গা করেননি। ইন্দিরা গান্ধি তখন ক্ষমতার সর্বোচ্চ অলিন্দে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জয়ের শিরোপার প্রধান স্থপতি এশিয়ার মুক্তিসূর্য। তারপর দেবকান্ত বড়ুয়ার মত মানুষেরা লাগামছাড়া স্তুতিতে ইণ্ডিয়া ইজ ইন্দিরা ইন্দিরা ইজ ইণ্ডিয়া—এইসব উচ্চকিত রবে তাঁর প্রশংসায় প্লুত। সুতরাং রাজনারায়ণের মামলা নিয়ে কেউ রা-টি কারলেন না।

কিন্তু আইনের পথ এগোতে লাগল তার নিজস্ব শ্লথ গতিতে। অবশেষে ১৯৭৫ সালের ১২ জুন বিচারপতি জগম্মোহন সিন্‌হা তাঁর রায়ে জানালেন ইন্দিরা গান্ধি অসদাচারণ করেই জিতেছেন নির্বাচনে, তাঁর জয় অবৈধ। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের অঙ্গনে এ রায় ঐতিহাসিক। পদত্যাগ করা ছাড়া ইন্দিরা গান্ধির আর কোনো গত্যন্তর নেই। সবাই সেটাই ভেবেছিলেন। বিরোধীরা, বামপন্থীরা আন্দোলন শুরু করলেন দেশ জুড়ে। ইন্দিরা পদত্যাগ করবেন না। রাজনারায়ণ সবুজ ফেট্টি বাঁধতেন মাথায়—বললেন, আমি ব্যাট করে ওভারবাউণ্ডারি হাঁকালাম, আম্পায়ার জানিয়ে দিলেন কিন্তু বোলার জানালেন আউট।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেভাবে অন্দোলন হয় সেভাবেই উত্তাল হয়ে উঠলো সারা ভারত। ইন্দিরা সরতে রাজি হলেন না। বেশ কিছু স্তাবক আইনজ্ঞ তাদের অন্যতম পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় (ইনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নাতি এবং বাহাত্তরে রিগিং করে নির্বাচনে জিতেছিলেন) এদের পরামর্শে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটছে বলে ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত নিলেন জরুরি অবস্থা জারির। রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন মধ্যরাত্রে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করলেন। সংবিধানের ৩৫২ ধারা বলে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে সাধারণ মানুষের সমস্ত অধিকার হরণ করলেন, খবরের কাগজে সেনসারশিপ বসলো, অনুমতিছাড়া কোনো খবর ছাপা যাবে না, পুলিশ কোনো প্রমাণ ছাড়াই যে কোনো মানুষকে গ্রেফতার করতে পারবে। এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা শুরু হল সারা দেশে। দিল্লিতে শুরু হল নাসবন্দী। নির্বিচারে ধরপাকড় শুরু হল। জয়প্রকাশ নারায়ণ, জ্যোতির্ময় বসু, মোরারজি দেশাই, অটলবিহারী বাজপায়ী, এল কে আদবানি, জর্জ ফার্ণান্ডেজ —এঁরা সব গ্রেফতার হলেন কোনো কারণ ছাড়াই। প্রথম কয়েকদিনের থমকে যাওয়া অবস্থাটা কাটতেই শুরু হল আন্দোলন নানা মতে পথে। সংবাদপত্র প্রথম কয়েকদিন কিছু অংশ সাদা রেখেই ছাপা হচ্ছিল, তাও বন্ধ করে দেওয়া হল। বেশ কয়েকজন সাংবাদিক গ্রেফতার হলেন, তাঁদের মধ্যে গৌরকিশোর ঘোষ, বরুণ সেনগুপ্ত অন্যতম। এক বর্বরোচিত পুলিশিতন্ত্র চললো। এমনকি ভূদান আন্দোলনের নায়ক আচার্য বিনোবা ভাবে পর্যন্ত মন্তব্য করলেন ইমারজেন্সি-অমরজেন্সি হবে কেন?

সেদিনের জেলবন্দী এল. কে. আদবানী আজকের দিনের বিজেপি সরকারের কাজকর্মে সেদিনের কোনো আবছায়া দেখতে পেয়েছেন কি? নইলে কেন, হঠাৎ মোদি সরকারের কাজকর্মে বিরক্ত হয়ে উঠলেন। দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ।

মিথ্যার বেসাতি। সব মিলিয়ে কোথায় যাবে দেশ। জিনিসপত্রের দরদাম প্রতিদিন উর্ধ্বগামী হচ্ছে। রাজ্য কেন্দ্র সব দিশাহারা করে দিচ্ছে জন-সাধারণকে। মানুষকেই এর সমাধানে সক্রিয় হতে হবে—নইলে শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর। ভারতের জনগণ এ পরীক্ষায় আগেই উত্তীর্ণ হয়েছেন। আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থার পর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে উচ্ছেদ করে এক বিকল্পের সন্ধান দিয়েছিলেন, যা ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিকে আরও দৃঢ় ও মজবুত করেছে।

মেধাবী ছাত্র নিখোঁজ কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২২ জুন : টিউশুনি পড়তে গিয়ে এক ছাত্র নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় উদ্বেগ ছড়ালো কালনায়। এলাকায় খুন, ছিনতাই বারাতে সাধারণ মানুষ উদ্বেগে আছে। নিখোঁজ কালনা এ্যাকাডেমিতে অষ্টম শ্রেণি-র ছাত্র শোভন পাল(১৩)। নিখোঁজ হবার সময় তার পরনে ছিল কালো রং-এর টি-শার্ট ও ভেনিস জিন্স, সঙ্গে কালো রং-এর স্কুলব্যাগ। পরিবারের পক্ষ থেকে কালনা থানায় ডায়রি করা হয়েছে। কেউ সন্ধান পেলে যোগাযোগ করুন ৯৭৩২৫৭৭৪২৬ নম্বরে।

জরুরি অবস্থার ৪০ বছর

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ২৬ জুন : আজ সি পি আই(এম) রানিগঞ্জ জোনাল কমিটির আহ্বানে 'আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থার ৪০ তম বর্ষ : বর্তমান পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলন' শীর্ষক এক আলোচনায় প্রধান বক্তা ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক। তিনি বলেন, বিজেপি সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে সমগ্র দেশে অস্থিরতা কায়েম করতে চাইছে। উদার অর্থনীতির মাধ্যমে গরিব মানুষের উপরে শোষণ-নীপিড়ন নামিয়ে আনছে। এর বিরুদ্ধে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভকে দমন করতে স্বৈরাচারী পদক্ষেপ নিচ্ছে, যা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদজনক।

বিশেষ ক্রোড়পত্র - সাঁওতাল হুল

জমিদার, মহাজন ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মহাসংগ্রাম—'হুল'

অনিল মাইতি

সাঁওতালি ভাষায় 'হুল' শব্দের অর্থ বিদ্রোহ, মহাবিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান। ''ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে সাঁওতালরা দমিন-ই-কোহ (রাজমহল পাহাড়তলি) এলাকায় আসতে থাকে। সেখানে বিস্তর উর্বর জমি পতিত বা জঙ্গলে ঢাকা পড়েছিল। তারা এখানে এসেছিল জমি পাবার জন্য এবং তাদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল বন কেটে জমি হাসিল করার জন্য। পঁচিশ বছরের মধ্যে প্রায় এক লাখ সাঁওতাল এসে প্রায় পাঁচ লাখ বিঘা জমি হাসিল ও আবাদ করে। তারা ভাবতো সে জমি তাদের নিজেদের, কিন্তু অল্পকালের মধ্যে জমিদার, মহাজনদের হাতে চলে যেতে থাকে।'' (মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল—'পশ্চিমবঙ্গ' সাঁওতাল বিদ্রোহ সংখ্যা—১৪০২)

শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৮৫৫/৫৬ সালে সাঁওতাল পরগণার ভাগনাডিহি গ্রামে যে বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল সেটাই 'হুল' নামে খ্যাত। কিন্তু তার পূর্বেও ১৮১১, ১৮২০, ১৮৩১ সালেও বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল, তবে তা 'হুল'-এর রূপ ধারণ করেনি। স্মরণীয় ১৭৮৪ সালে বাবা তিলকা মাঝির (মুর্মু) নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ সংগঠিত হয় তাকে 'হুল'-এর সূচনাপর্ব হিসাবে চিহ্নিত করেন বিশেষজ্ঞগণ। রাজমহল এলাকার আদিবাসী সাঁওতালরা বংশপরম্পরায় জঙ্গলের সমস্ত সম্পদ ভোগদখল করে আসতো। কিন্তু ইংরেজ শাসকরা জবর দখল করতে গেলে বাবা তিলকা মাঝির নেতৃত্বে সংগঠিত হয় বিদ্রোহ। বিদ্রোহ দমন করতে এলে বাবা তিলকা মাঝির বাটুলের আঘাতে নিহত হয় ভাগলপুরের কালেক্টর ক্লিভল্যান্ড। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর ধরা পড়েন তিনি। তাঁকে ঘোড়ার ল্যাজে বেঁধে টানতে টানতে সারা ভাগলপুর শহর ঘোরানো হয়। তারপর অচৈতন্য অবস্থাতে একটি গাছের ডালে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়।' ('মুক্তির সংগ্রামে ভারত' দ্রষ্টব্য)

রাজমহল এলাকার জমি খুবই উর্বর হওয়ার জন্য ফসল ফলতো অধিক পরিমাণে। জমিদার ও মহাজনরা ওই ফসল লুটের জন্য দাদন দিতো। সুদের হার ছিল ৫০ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত। ফলে বংশপরম্পরায় ওই ঋণ শোধ হতো না। বরং বেড়েই যেতো। যার জন্য গরু, ছাগল এমনকি লাঙলও চলে যেতো মহাজনের ঘরে। সম্ভ্রম খোয়াতে হতো মেয়েদের।

ধান ওঠার সময় মহাজনরা গ্রামে গ্রামে ক্যাম্প খুলে বসতো। সঙ্গে থাকতো তাদের পাইক-বরকন্দাজ। তাদের থাকা, খাওয়া এমনকি আনন্দ স্ফূর্তির সমস্ত খরচ বহন করতে হতো গরিব সাঁওতাল কৃষকদের। ওজনের জন্য থাকতো দু'রকমের বাটখারা (বাটখারার নামে সিঁদুর-মাখা পাথরের চাঁই)—একটি 'কেনারাম' অপরটি 'বেচারাম', অথবা 'বড়বৌ-ছোটবৌ'। তখনকার দিনে ওই এলাকার মানুষরা কুড়ির (বিশ) বেশি গুনতে জানতেন না। তাই সহজ সরল মানুষদের ঠকিয়ে মহাজনরা বস্তা বস্তা ধান নিলেও কুড়ি আর হতো না। ব্যাকুল হয়ে গরিব সাঁওতাল কৃষকরা বলতেন—'একবার বিশ বোল বাবু—একবার বিশ বোল।' কিন্তু বিশ আর হতো না।

এই সময় ওই এলাকায় চলছিল রেললাইন বসানোর কাজ। এলাকার মানুষদের জোর করে ওই কাজে নিয়ে যাওয়া হতো। তাদের দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করিয়েও কোনো মজুরি দেওয়া হতো না। ফলে বহু মানুষ এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই বলগাহীন শোষণ ও অত্যাচারের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ জমতে জমতে বারুদের স্তূপে পরিণত হয়।

১৮৫৫ সালের ৩০ জুন। ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটলো সাঁওতাল পরগণার ভাগনাডিহি গ্রামের মাঠে। ৪০০টি গ্রামের হাজার হাজার সাঁওতাল কৃষকদের জমায়েত জনসমুদ্রের আকার ধারণ করে। এই সমাবেশ থেকেই তাঁরা সিধু ও কানুকে নেতা নির্বাচন করেন। তাঁদের আরো দুই ভাই—চাঁদ ও ভৈরব হন প্রধান সহযোগী। চার ভাইই ছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। এই সমাবেশ থেকেই জানানো হয় 'হুল' এর আহ্বান। 'হুল'—বিদ্রোহ, মহাবিদ্রোহ।

পূর্বে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে বার বার দরবার করেও কোনো ফল না পাওয়ায় ওই দিনই তাঁরা বড়লাটের উদ্দেশ্যে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। তাঁদের সাথে যোগ দেন কামার, কুমোর, তেলি, ডোম, কুর্মী, বাগদি ও মোমিন সম্প্রদায়ের দরিদ্র মুসলমানরা। সকলেই বঞ্চনার শিকার। কামার সম্প্রদায়ের মানুষরা এই সময় তীরের ফলা (কাঁড়) ও অন্যান্য অস্ত্র তৈরি করে দিয়ে প্রভূত সাহায্য করেন। এই বিরাট সংখ্যক মানুষের অভিযানে ও রণহুঙ্কারে কেঁপে ওঠে সারা সাঁওতাল পরগণা। শঙ্কিত হয় জমিদার, মহাজন ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসককুল। অভিযান ঠেকাতে এসে নিহত হয় কুখ্যাত মহেশ দারোগা। দিনটা ছিল ৭ জুলাই ১৮৫৫। নিহত হয় আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসার, জমিদার ও মহাজন। এরপর বিরাট সংখ্যক বাহিনী নিয়ে মাঠে নামে মেজর ব্যারোজ। পাঁচ ঘন্টা চলে উভয় পক্ষের মরণপণ লড়াই। অবশেষে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে বাধ্য হয় মেজর ব্যারেজ। সংগ্রামী মানুষের জয়ধ্বনিতে উদ্বেলিত হয় রণাঙ্গন।

১২ জুলাই বিদ্রোহীরা দখল করে পাকুড়ের রাজবাড়ি। এই রাজবাড়ি ছিল বিদ্রোহ দমনের কেন্দ্রস্থল। রাজবাড়ি তখন পুরুষশূন্য। কানুর নির্দেশে রাজবাড়ির মহিলাদের সসম্মানে সরিয়ে দিয়ে তাঁরা শুধুমাত্র খাবার সংগ্রহ করেন। এই সময় তাঁরা উপলব্ধি করেন, আর আবেদন নিবেদনে কোনো কাজ হবে না। তাই তাঁরা সচেতন ভাবেই ডাক দেন—'অবসান চাই ইংরেজ শাসনের।' এই প্রথম তাঁরা রাজনৈতিক আওয়াজ তোলেন।

আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। সমগ্র এলাকা তখন কার্যত বিদ্রোহীদের দখলে। ভীত, সন্ত্রস্ত শাসকদল জারি করে সামরিক আইন। দমন পীড়ন ওঠে চরম পর্যায়ে। জানা যায় এই আন্দোলনের ব্যাপ্তি ঘটেছিল বর্ধমান জেলার আসানসোল, রানিগঞ্জ এলাকায় এবং বীরভূম জেলার ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে। ছড়িয়ে পড়েছিল বাঁকুড়া জেলাতেও।

'হুল'-এর মহানায়ক কানুর স্ত্রী ফুলকি বা ফুলমণির নেতৃত্বে গড়ে ওঠে নারীবাহিনী। তাঁরা গ্রাম পাহারা দিতেন, রণাঙ্গনে অস্ত্র, জল ও খাবার পৌঁছে দিতেন। ব্রিটিশ পুলিশ ও ফৌজ তাঁদের উপর নৃশংস পাশবিক অত্যাচার চালায়। শত্রুর কাছে তাঁরা আত্মসমর্পণ করেননি। মরণপণ লড়াই করে তাঁরা শহিদের মৃত্যু বরণ করেন।

এই বিদ্রোহের মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের কী শৃঙ্খলাবোধ ছিল তা একটি উদাহরণ থেকেই বোঝা যায়—''সরকারি সৈন্যদের হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য সরে গিয়ে একবার ৫৫ জন বিদ্রোহী একটি মাটির ঘরে আশ্রয় নেয়। তখন সৈন্যরা তাদের ঘেরাও করে আত্মসমর্পণ করতে বললে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়ে তার জবাব দিতে থাকে। সৈন্যরা গুলি চালাতে থাকে। ক্রমে যখন দেখা যায় তীর আর আসছে না, তখন একজন সিপাই ভিতরে ঢুকে দেখে একজন বৃদ্ধ সাঁওতাল ছাড়া বাকি সকলেই শহিদ হয়েছেন। বৃদ্ধকে আত্মসমর্পণ করতে বললে, বৃদ্ধ তাকে টাঙি দিয়ে হত্যা করে।'' (মুঃ আঃ রসুল—'পশ্চিমবঙ্গ' সাঁওতাল বিদ্রোহ সংখ্যা ১৪০২) জানা যায় নেতৃত্বের নির্দেশ ছিলো যতক্ষণ ধামসার শব্দ শোনা যাবে ততক্ষণ একজন বিদ্রোহীও রণাঙ্গন ছেড়ে যাবে না। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও পালাবার বহু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেউ রণাঙ্গন ছেড়ে যাননি। (সূত্র—ওই)

প্রায় দেড় বছর চলে এই মহাসংগ্রাম। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় লেখেন ''... পনেরো থেকে পঁচিশ হাজার সাঁওতাল এই বিদ্রোহে প্রাণ হারিয়েছিল।'' (বঙ্গানুবাদ—গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত / হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হিন্দু পেট্রিয়ট) বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলেন ৫০ হাজার সাঁওতাল কৃষক ও অন্যান্যরা।

—এরপর চারের পাতায়

হুল-এর খোঁজে ভগনাডিহিতে

শিবানন্দ পাল

ভগনাডিহির শহিদ স্থল

রেভারেন্ড চৈতন্য হেমব্রম লিখিত 'সান্থাল পারগণা। সান্থাল আর পাহাড়িয়াকোওয়াক্' বই থেকে জানা যায় রাজমহল পাহাড়ের দক্ষিণে বীরভূমের আর মানভূমের দামোদর নদ পর্যন্ত এলাকায় পূর্বতন বসবাসকারী পাহাড়িয়াদের সঙ্গে সাঁওতালরা ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে বসবাস শুরু করে। পাহাড়ের আশেপাশে উর্বর ও সমতল জমি পেয়ে সাঁওতালরা মহানন্দে বনজঙ্গল কেটে পরিস্কার করে বসতি স্থাপন শুরু করে দেয়। ইংরেজরা এই অঞ্চলটিকে 'দামিন-ই-কোহ' নামে চিহ্নিত করেছিল। বনজঙ্গল কেটে চাষাবাদ ও বসতি স্থাপনের উদ্যোগে গ্রামের সংখ্যা বাড়তে থাকায় ১৮০৯ সালে দুমকা মহকুমায় এবং ১৮১৮ সালে গোড্ডা মহকুমায় সাঁওতালরা প্রবেশ করে। কিন্তু হিন্দু জমিদার এবং মহাজনরা পাহাড়ি এই এলাকায় নব্য জনপদগুলিকে দখল করতে থাকায় সমস্যা শুরু হয়। সেজন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দামিন-ই-কোহ'র সীমানা নির্ধারণ জরুরি মনে করে। দামিন-ই-কোহ'র সীমানা নির্ধারণ এবং পিলপা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পরে জন পেটি ওয়ার্ড-এর ওপর। ১৮৩২-৩৩ সালে সার্ভেয়ার ক্যাপ্টেন ট্যানার-এর সহযোগিতায় পেটি এলাকার সীমানা নির্ধারণের কাজ সম্পূর্ণ করেন। ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের ১৩৬৬.০১ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে দামিন-ই-কোহ'র সীমানা নির্ধারিত হয়। এর মধ্যে মোটামুটি ৫০০ বর্গমাইল এলাকা ছাড়া প্রায় সমস্তটাই পাহাড়ি অঞ্চল। আবার ৫০০ বর্গমাইলের মধ্যে ২৪৬ বর্গমাইল শুধু জঙ্গল। মাত্র ২৫৪ বর্গমাইল এলাকা আবাদযোগ্য জমি। সীমানা নির্ধারণ সম্পূর্ণ হওয়ায় গভর্ণর বেন্টিঙ্ক রাজমহলের পশ্চিম দিকের জঙ্গল পরিষ্কার করে বসবাস করবার জন্য সাঁওতালদের আহ্বান জানানোর ব্যবস্থা করেন। সেই সময় কটক, ধলভূম, মানভূম, বরাভূম, ছোটনাগপুর, পালামৌ, হাজারিবাগ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সাঁওতালরা দলে দলে দামিন-ই-কোহ'তে এসে বসবাসের জন্য উপস্থিত হয়।

চৈতন্য হেমব্রম সাহেবের বই থেকে আরও জানা যায় যে, সাঁওতালরা মনে করেছিল এই এলাকায় তাদের পূর্বতন রীতিনীতি, পূজাপার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়গুলিসহ সামাজিক শৃঙ্খলারক্ষাকারী ব্যবস্থাপকদের নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। তারা নতুন করে তাদের স্বপ্নের চম্পানগরী গড়ে তুলবে এই বিশ্বাস নিয়ে দামিন-ই-কোহ'তে আসে। কারণ দামিন-ই-কোহ এলাকায় সাঁওতালরা যাতে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে তার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জেমস পটেন্ট-কে সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত করেছিল। জেমস পটেন্ট খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য দামিন-ই-কোহ'কে কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত করেন। কিন্তু আদি বাসিন্দা পাহাড়িয়া ঘাটোয়ালরা যে সুযোগ সুবিধা পেয়ে আসছিল, সাঁওতালদের সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। অপর দিকে এই জায়গায় মহাজনদের সুযোগ দেওয়া হয় সাঁওতালদের শস্য সম্পদ আত্মসাৎ করবার। দামিন-ই-কোহ'র চেহারা তখন সুন্দর শস্য শ্যামল। অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে সাঁওতালদের ছোট ছোট গ্রাম। লাল, কালো, সাদা রঙের নানা রকম জীবজন্তু লতাপাতার ছবি আঁকা মাটির দেওয়ালের মাথায় খড়ের ছাউনি। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনায় দেখা গেল সমগ্র অঞ্চলে ৮২, ৭৯৫ জনসংখ্যা নিয়ে ১,৪৩৭ টি গ্রাম গড়ে উঠেছে।

ঐতিহাসিক কালীকিঙ্কর দত্ত 'দি সান্থাল ইনসারেকশন অফ ১৮৫৫-৫৭' বইতে লিখেছেন, ওই সব জনপদে আকৃষ্ট হয়ে পশ্চিমের সাহাবাদ, ছাপরা, বেতিয়া, আরা ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভোজপুরী, ভাটিয়া প্রভৃতি এলাকা থেকে এসেছিল লোভী ব্যবসাদার, মহাজনরা। আর আশপাশের অঞ্চল থেকে এসেছিল কিছু গরিব হিন্দু-মুসলমান মেহনতি মানুষ রুটি ও রুজির খোঁজে। এরা হল কামার, কুমোর, কুর্মি, তেলি, মোমিন-আনসারি, দত্ত, ভগৎ ইত্যাদি। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে লিটিপাড়া, হিরণপুর, বারহেট বড় বাজার তৈরি হয়েছিল। এই বারহেট-এর অনতিদূরে ভগনাডিহি গ্রাম। যেখানে ১৮৫৫-র ৩০ জুন সিধু-কানু-চাঁদ-ভৈরব, চার ভাইয়ের ডাকে দশ হাজার সাঁওতাল সমবেত হয়ে শপথ নিয়েছিল জমিদার মহাজন পুলিশ পাইক পেয়াদাদের অত্যাচার আর সহ্য করবে না। দামিন-ই-কোহ থেকে সমস্ত শোষক-উৎপীড়ককে বিতাড়িত করে জমি দখল করবে ও স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। হাজার হাজার অরণ্যসন্তানদের কণ্ঠে সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল, 'দেলায়া বিরিদ্ পে, দেলায়া তিঙ্গুন পে'—জাগো, ওঠো, সাঁওতালরাজ কায়েম কর। মূল লড়াইটা ছিল জমির অধিকার। আর এর পশ্চাতে ছিল ইংরাজ প্রভুদের জমি সংক্রান্ত নীতি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

১৬০ বছর পর ১৪ জুন, ২০১৫ ভগনাডিহিতে হাজির হলাম। গ্রামে ঢোকার মুখেই ঐতিহাসিক ভগনাডিহির প্রান্তর। ভগনাডিহির সেই বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে মন খারাপ হয়ে গেল। জানা গেল, প্রান্তর নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এখানে নাকি মুসলিমদের কবরখানা ছিল! প্রথমে দামিন-ই-কোহ তারপর সাঁওতাল পরগণা, তারপর সাঁওতাল পরগণাকে ভেঙে পাকুড়, সাহেবগঞ্জ, গোড্ডা ও দুমকা জেলা করা হয়েছে। মাঝে বিহার থেকে ভেঙে ঝাড়খন্ড পৃথক হয়েছে। এখন সেই ভগনাডিহির অস্তিত্বের সঙ্কট? বিতর্কের ঝড় ওঠে। হিন্দুস্তান না পাকিস্তান, ভারত না চীন! এল ও সি, প্রশাসন তাই একটি অংশ পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দিয়েছে! ডিভাইড এন্ড রুল, সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে। দেশ স্বাধীন, কেন্দ্র এবং ঝাড়খন্ড রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় বিজেপি দল। উন্নয়ন ও সুদিনের নামে একের পর এক জনস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ চলছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়াত্ত সংস্থাসহ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ তারা বেচে দিতে চায় বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে, এমনকি দেশের মানুষের সৌহার্দ্য নষ্ট করে দিতে চায় সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপের মাধ্যমে। তার চরমতম প্রমাণ পেলাম খোদ ভগনাডিহির ঐতিহাসিক প্রান্তরে দাঁড়িয়ে।

চার ভাইয়ের মধ্যে সিধু বড় এবং একমাত্র বিবাহিত ছিলেন। সাঁওতালদের পারিবারিক গঠন পিতৃতান্ত্রিক। মেয়েরা পৈত্রিক সম্পত্তি দাবি করতে পারে না। কিন্তু পিতা সাধারণত প্রত্যেক মেয়েকে একটি করে গাভী দেন। এছাড়া তিনি স্বেচ্ছায় মেয়ে-জামাইকে কিছু ধন-সম্পদ বা সম্পত্তি দান করে যেতে পারেন। সাঁওতাল সমাজে ঘরজামাই প্রথার বহুল প্রচলন। সেই অর্থে সিধু ছিলেন ভগনাডিহিতে ঘরজামাই। তাঁর পৈত্রিক বাড়ি ছিল বর্তমান সাহেবগঞ্জ জেলার রাঙ্গা থানার শিমুলঢাক গ্রামে। সিধুর স্ত্রীর নাম ছিল সুমি। নারায়ণ ও টিরকু তাঁদের দুই সন্তান। নারায়ণের দুই ছেলে ভাদো ও দাসমত। ভাদোর এক পুত্র বাবুলাল। দাসমতের চার পুত্র ছোটু, রস্কা, মন্ডল এবং হপনা। উপস্থিত হলাম সিধুর পৌত্র ভাদো-র পুত্র, অর্থাৎ সিধুর প্রপৌত্র বাবুলালের পুত্র ভাদো (দ্বিতীয়) মুর্মুর বাড়িতে। এঁর নামও ভাদো, সাঁওতাল পরিবারে পৌত্র প্রপৌত্রদের নাম বাবা, কাকা, জ্যাঠা বা দাদুদের সঙ্গে মিলিয়ে রাখার একটা ঐতিহ্য আছে। যেমন, এই ভাদোর চার কন্যা সঞ্জু, মঞ্জু, বাহা এবং তালাময়ী। এক মাত্র পুত্রের নাম বাবুলাল। এই বাবুলালের বয়স সবে মাত্র চার মাস। সিধু-র ষষ্ঠ উত্তরসূরি।

গ্রামের প্রথম বাড়িটিই সিধুদের। এক পাঁচিলে ঘেরা পাশাপাশি বাড়িতে বর্তমান প্রজন্মের আটটি পরিবারের বাস। কাঁচা-পাকা মিলিয়ে সাঁওতালি ঐতিহ্যের পরম্পরা মেনে বাড়িগুলি তৈরি। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সহায়তায় বাড়িগুলি তৈরি হয়েছে। বাড়ির ভিতরের উঠোনে বিদ্রোহী দুই ভাইয়ের মূর্তি রয়েছে। ২০০৪ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৫০ বছর

—এরপর চারের পাতায়

হুল'এর খোঁজে

—তিনের পাতার পর

উদযাপনের প্রাক্কালে ঝাড়খন্ড সরকার সিধু-কানুর বংশধরদের চাকরি দেবার আগ্রহ প্রকাশ করায় ভাদো সাহেবগঞ্জ কলেজে চতুর্থ শ্রেণীর পদে চাকরি পান। চারপাশে উন্নয়ন বলতে রাস্তার মোড়ে মোড়ে সিধু-কানু বা তিলকা মাঝিদের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর কিছু বাড়িঘর হয়েছে। ৩০শে জুন হুল দিবস উপলক্ষ্যে ভগনাডিহিতে মুখ্যমন্ত্রীসহ রথী-মহারথীদের আগমন ঘটে। ঝাড়খন্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রতিবছরই এমন হয়। তারজন্য রাস্তায় পিচ পড়ে, সরকারি অফিস আবাস রঙ হয়। এ বছর সিধু-কানুর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে বিশাল পার্ক তৈরির কাজ চলছে। পার্কের উল্টোদিকে সিধু-কানুর নামে স্টেডিয়াম রয়েছে। গ্রামজুড়ে একটা সাজোসাজো ভাব। স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এদিন সরকারি আধিকারিকদের তদারকি বৈঠক করতে দেখা গেল। গ্রামের আদিবাসী ছেলেরাও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে মেতেছে।

ভাদোরা চাকরি পেয়েছেন, নিয়মিত রেশন ব্যবস্থায় উপকৃত হচ্ছেন, সরকারি বদান্যতায় বাড়ি ঘরের অবস্থা ভালো। গ্রামের রাস্তাঘাট মোটামুটি, বছরে একটি বার অন্তত মেরামতি হয়, ওঁতেই ওঁরা সন্তুষ্ট। কিন্তু এটা তো রাজ্যজুড়ে সমস্ত আদিবাসীদের চেহারা নয়! গত বিধানসভার নির্বাচনে আদিবাসী নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবু সোরেন-এর ছেলে হেমন্ত সোরেন জেএমএম প্রার্থী হিসাবে এই বারহেট কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপি-র হেমলাল মুর্মুকে ৬২,৫১৫ ভোটে হারিয়ে। আর তিনি নিজের কেন্দ্র দুমকায় হেরেছেন বিজেপি প্রার্থী লুইস মারান্ডির কাছে ৬৫,১০৫ ভোটে। বারহেট কেন্দ্রে হেমন্ত সোরেন জিতেছেন আনসারিদের (আদিবাসী নয়) ভোটে।

শিক্ষাদীক্ষায় অনেক পিছিয়ে ভগনাডিহি গ্রাম। বিশাল এলাকাজুড়ে একলব্য স্কুল বিল্ডিং তৈরি। ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের অভাবে খাঁ-খাঁ করছে। এখানে কে পড়তে আসবে যোগাযোগ ব্যবস্থাই নেই! ভগনাডিহিতে মিডল স্কুল একটা। হাইস্কুল বারহেটে। কাছাকাছি কলেজ বলতে বারহারোয়া অথবা সাহেবগঞ্জে। বোরিওতে শিবু সোরেন জনজাতি বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়েছে। গ্রামে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। সেখানে কোনও ডাক্তার আসে না। একজন নার্স দায়িত্বে। কেউ অসুস্থ হলে স্থানীয় ওষুধের দোকান অথবা কোয়াক্ ডাক্তার। প্রসূতিদের প্রসব বাড়িতেই। সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে। শৌচালয় ব্যবহার নৈব নৈব চ! ভগনাডিহির কাছাকাছি লালমাটিয়ায় কয়লা পাওয়া যাওয়ায় এখানকার সামাজিক অর্থনৈতিক বিন্যাস নতুন অভিমুখে পরিবর্তিত হয়েছে। খোলামুখ কয়লা খাদান, এন টি পি সি-র রেল লাইন, লোডার, ডাম্পার, রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস ইত্যাদি আধুনিক প্রযুক্তিতে কাজ চলছে ওই সব খাদানে। বারহেট তাই নতুন করে জেঁকে বসার সুযোগ পেয়েছে নব্য জগৎশেঠ, উমিচাঁদ আর মীরজাফরদের নিয়ে। সিধু কানুর উত্তরসূরিরা এখনও ভাল করে জানেন না, কে তাদের আসল মিত্র, কে তাদের শত্রু।

সাঁওতাল পরিবারে বাবার অবর্তমানে বড় ছেলেই কর্তা। সিধুদের পরিবার ছিল মাতব্বর বা মাঝি। সেইজন্য হুলের সময় সকলে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন। সাঁওতালদের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রাধান্য। এঁদের প্রধান দেবতা মারংবুরু হলেও সিধু শিবজ্ঞানে এক খণ্ড শিলাকে নাকি স্নান করে রোজ পুজো করতেন। গ্রামের ভিতরে সেই স্থান দেখা হল। একটি চুঁইয়ে আসা জলাধারের পাশে পাথরের একটুকরো অবয়ব। ঠিক শিবলিঙ্গ বলা যায় না। জলাধারটি ভগ্নদশায়। জলাধারের পারে খেজুর গাছের গোড়ায় মুক্ত আকাশের নিচে দেবতার থান।

এরপর গেলাম পাঁচকাঠিয়া। বারহেট থানার অদূরে এখানে সিধু-কানুকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইংরাজ সৈন্যরা সিধুকে গ্রেপ্তার করে। তার কয়েক দিন পরে ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বীরভূমের ওপর বাঁধের জামতাড়া এলাকায় সশস্ত্র পুলিশের হাতে কানুও গ্রেপ্তার হয়। ব্র্যাডলি বার্ট-এর রিপোর্ট বলছে, 'চার ভাইয়ের সবচেয়ে বড় এবং দলের প্রধান নেতা সিধু ধরা পড়লো এবং একটি সংক্ষিপ্ত বিচারের পর মিঃ পটেন্ট বারহেট-এ এক বিরাট জনসমষ্টি, যারা পরাজয়ের একটা আত্মগ্লানি নিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করছিল, তাদের সামনে তাকে ফাঁসি দিলেন।' ছটরায় দেশমাঝির বিবরণ থেকেও জানা যায়, স্থানীয় ঝিলিমিলি মাঠে মহুয়া গাছে সিধু-কানু দু-জনেরই ফাঁসি হয়েছিল। শহিদ স্মৃতির এই জায়গা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। পাশে তৈরি 'হুল ভবন'টির দশা দেখে আবার মাথা নিচু হয়ে গেল। গরু চড়ছে। বর্ধমানরাজ মহতাব চন্দ সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনে ইংরাজ প্রভুদের বহুভাবে সাহায্য করে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। প্যাটারসনের (১৯১০) তৈরি ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে লেখা আছে, 'at the time of santhal rebellion in 1855, the Maharaja, Mahatab chand aided the Military authorities by forwarding and supplying stores and means of transport.' ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুলাই বর্ধমানের কমিশনার মিঃ এলিয়ার্ট নদীয়ার কমিশনার এ সি বি জে এল-কে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গীপুরের দশ ক্রোশ দূরে মলটিম সরাইয়ের একটি ঘরে ৬০ জন সাঁওতালকে আবদ্ধ অবস্থায় গুলি করে হত্যা করেছিল। এই হত্যাকান্ডে বর্ধমানরাজের সৈন্যরা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল।

শহিদ সিধু-কানুর অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

জমিদার, মহাজন...

—তিনের পাতার পর

১৮৫৫ সালের নভেম্বর মাসে মেঝিয়া বা মুনিয়া নামে এক বিশ্বাসঘাতকের বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়েন সিধু। তাঁকে ভাগনাডিহি গ্রামে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। মতান্তরে তাঁর বাড়ির সামনে একটি গাছের ডালে ফাঁসি দেওয়া হয়। খবর শোনা মাত্র মুনিয়াকে ধরে এনে কানু তার মৃত্যুদণ্ড দেন। রণাঙ্গনে মৃত্যু হয় চাঁদ-ভৈরবের।

১৮৫৫ সালের ৩০ নভেম্বর জারোয়ার সিং নামে আর এক বিশ্বাসঘাতকের তৎপরতায় ধরা পড়েন 'হুল' -এর মহানায়ক কানু। তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে পাঠানো হয় সিউড়িতে। '৫৬ সালের ১৪, ১৫, ১৬ জানুয়ারি স্পেশাল অফিসার ইলিয়টের এজলাসে বিচারের নামে হয় প্রহসন। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় তাঁকে। বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নর হ্যালিডের আদেশে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার জন্য তাঁকে আনা হয় ভাগনাডিহি গ্রামে। তাঁদের যে ঠাকুরবাড়িতে বিদ্রোহের সূচনা, সেখানেই তৈরি করা হয় ফাঁসির মঞ্চ। '৫৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বেলা পৌনে দুটা নাগাদ তাঁকে তোলা হয় ফাঁসির মঞ্চে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাঁর মানসিক দৃঢ়তা ও প্রশান্তি ছিল অক্ষুণ্ণ। ছিল শত্রুর প্রতি সীমাহীন ঘৃণা। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এক বিদেশি সাংবাদিক লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন— ''ফাঁসির পূর্ব মুহূর্তেও তাঁর মধ্যে ভয় বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্র আমাদের চোখে পড়লো না।'' ('বেঙ্গল হরকরা'—১লা মার্চ ১৮৫৬)। তাঁকে ৪৫ মিনিট ঝুলিয়ে রাখার পর নামিয়ে এনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তাঁর মরদেহটি তাঁর আত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। সেদিন সারা পরগণার কারো ঘরে উনুন জ্বলেনি।

বহু দমন, পীড়ন ও আত্মত্যাগের পর আপাত পরিসমাপ্তি ঘটলো 'হুল' -এর—একটি মহাসংগ্রামের। যে সংগ্রাম তুলনাহীন। যার ত্যাগ, তিতিক্ষা ও শৃঙ্খলা ইতিহাসে বিরল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের যোগ্য স্থান হয়নি। কিন্তু 'হুল'-এর ইতিহাস কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। চিরভাস্বর হয়ে থাকবে সংগ্রামী মানুষের মনে। 'হুল'-এর মৃত্যু নেই, মৃত্যু নেই ৩০ জুনের। 'হুল' দীর্ঘজীবী হোক।

তথ্যসূত্র—

১। মুক্তির সংগ্রামে ভারত—পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর প্রকাশিত।
২। 'পশ্চিমবঙ্গ'—সাঁওতাল বিদ্রোহ সংখ্যা
৩। ভারতের কৃষকবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম—সুপ্রকাশ রায়।
৪। সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস—বীরেন্দ্রনাথ বাস্কে।
৫। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হিন্দু পেট্রিয়ট—গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত।
৬। মরেও যারা মরে না (যাত্রাপালা)—আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন; ২। ডা. জোনাস এডওয়ার্ড শালক, মৃত্যু - ১৯৯৫ সালের ২৩ জুন; ৩। রাজা রাজেন্দ্র নাথমল্লিক, ২৪-৬-১৮১৯; ৪। ১৯৭৭ সালের ২৪ জুন, ১৩-৬-১৯৮২ পর্যন্ত; ৫। ১৯১৩ সালের ২৫ জুন, কুলডিহায়, শহিদ হন ১৫-১১-১৯৩৮; ৬। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন; ৭। আফ্রিকা মহাদেশে, ১৯৬০ সালের ২৬ জুন, আন্তনানারিভো; ৮। ১৯৬৫ সালের ২৭ জুন; ৯। ১৯৬৭ সালের ২৭ জুন, লন্ডনের বার্কলেব্যাংকের এলফিন্ড শাখায়, জন শেভার্ড; ১০। আফ্রিকা মহাদেশ, ১৯৭৭ সালের ২৭ জুন, জিবুটি; ১১। ১৮৫৪ সালের ২৮ জুন; ১২। ১৮৯৮ সালের ২৯ জুন, শেষ হয় ১৯০৩ সালের ২ নভেম্বর।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি রাখু কর্মকার, পিতা - কানাই কর্মকার, কাঞ্চননগর, রথতলা, পোঃ - কাঞ্চননগর, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৫ জুন, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম রাখু কর্মকার, যা আমার আধারকার্ড ও প্যানকার্ডে নথিভুক্ত আছে। কিন্তু রেশনকার্ডে ভুলবশত দাখু কর্মকার নথিভুক্ত হয়েছে। রাখু কর্মকার ও দাখু এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি শ্রী অমল চার, পিতা - নিরাপদ চার, গ্রাম - রায়না, বিশেশ্বরবাটি, পোঃ - রায়না, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৫ জুন, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম কমলিকা চার ও স্ত্রী নাম সোমা চার ও জন্ম তারিখ ২২ ডিসেম্বর, ২০১০। কিন্তু জন্মশংসাপত্রে আমার কন্যার নাম কমলিকা চার, পিতা - অমল চার-এর পরিবর্তে HARSHITA CHAR, D/O- AMAL CHAR নথিভুক্ত হয়েছে। HARSHITA CHAR, D/O-AMAL CHAR এবং KAMALIKA CHAR এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি উষা রানি মাঝি, স্বামী - সুভাষ মাঝি, লক্ষ্মীপুর মাঠ (রামমুদি স্টোরের নিকট) বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৪ জুন, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার নামের প্রকৃত নাম হল . Usha Rani Majhi যা ভোটার পরিচয়পত্রে ও অন্যান্য নথিতে নথিভুক্ত হয়েছে। কিন্তু রেশনকার্ডে উষা রানি মাঝির পরিবর্তে উষা মাঝি নথিভুক্ত হয়েছে। উষা রানি মাঝি ও উষা মাঝি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি গৌতম বোস, পিতা - প্রয়াত বিশ্বনাথ বোস, বড়নীলপুর, মেঘনাদ কলোনী, পোঃ - শ্রীপল্লী, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্টেট বর্ধমানের নিকট ২৫ জুন, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম গোপীনাথ বোস, যা তার স্কুল সার্টিফিকেটে নথিভুক্ত আছে। জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত গৌতম বোসের পরিবর্তে রাজকুমার বোস নথিভুক্ত হয়েছে। গোপীনাথ বোস এবং রাজকুমার বোস, পিতা - গৌতম বোস এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সারাবাতিয়া মাহাতা, স্বামী - দেবনারায়ণ মাহাতা, রথতলা, মুচিপাড়া, পোঃ - কাঞ্চননগর, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৩ জুন, ২০১৫ তারিখে এক এফডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার সঠিক নাম সারাবাতিয়া মাহাতা যা আমার ভোটার কার্ডে নথিভুক্ত আছে। কিন্তু রেশনকার্ডে ভুলবশত সারাবাতিয়া মাহাতার পরিবর্তে সরস্বতী মাহাতা নথিভুক্ত হয়েছে। সারবাতিয়া মাহাতা এবং সরস্বতী মাহাতা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি ডলি সাউ, স্বামী - সঞ্জয় সাউ, রথতলা, ইটভাটা কলোনী, পোঃ - কাঞ্চননগর, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৪ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার নাম SANAA SHOW, যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত SANA SHOW -এর পরিবর্তে SONA SHOW নথিভুক্ত হয়েছে। সানা সাউ ও সোনা সাউ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি রমেশ চন্দ্র রায়, পিতা - প্রয়াত রাধিকা রঞ্জন রায়, গ্রাম - কালিমোহনপুর, পোঃ - বেলকাশ, থানা - গলসি, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২১ মে, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যা ও স্ত্রীর প্রকৃত নাম যথাক্রমে অনন্যা রায় ও অনিমা রায়। কিন্তু আমার কন্যার জন্মশংসাপত্রে তার নামের জায়গায় তার মায়ের নাম অনিমা রায় এবং মায়ের নামের জায়গায় মেয়ের নাম অনন্যা রায় ভুলবশত নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমার মেয়ে অনন্যা রায় এবং পিতা - রমেশচন্দ্র রায়, মাতা - অনিমা রায় নামে সর্বত্র পরিচিত হল।

● আমরা বনশ্রী মণ্ডল, স্বামী - সজল মণ্ডল, গ্রাম ও পোঃ - আমরুল, জেলা - বাঁকুড়া ও শ্যামল তা, পিতা - প্রতিভা তা, গ্রাম ও পোঃ - বুজরুক দিঘি, থানা - রায়না, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৬ জুন, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, বনশ্রী হাটি, পিতা - সুশান্ত কুমার হাটি, সজল মণ্ডল-এর সাথে বিবাহ সূত্রে বনশ্রী মণ্ডল হয়। সজল মণ্ডল ৬ জুলাই, ২০১৪ তারিখে প্রয়াত হন। বনশ্রী হাটি ওরফে বনশ্রী মণ্ডল এবং আমি শ্যামল তা হিন্দু বিবাহ মতে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হই ও ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখ হতে একত্রে বসবাস করছি। বনশ্রী মণ্ডল, স্বামী - সজল মণ্ডল বর্তমানে বনশ্রী তা, স্বামী - শ্যামল তা নামে সর্বত্র পরিচিত হল।

গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৫০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। ***-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি।***

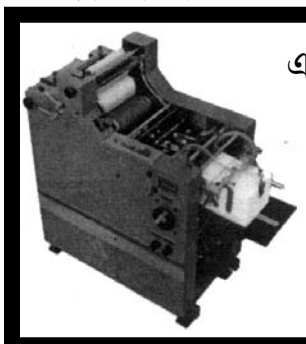

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

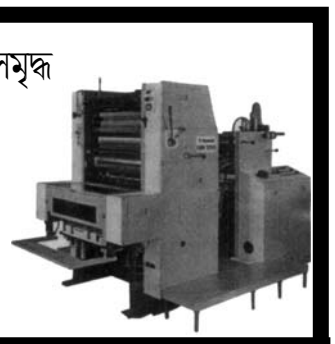

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা